দুঃস্বপ্নের সহনাগরিক

শুভম রায়চৌধুরী

আজ চালাক আমি কাল বোকা,
মহৎ প্রেমিক ন্যাকা ন্যাকা,
আমার আসল চেহারা কি
চিনতে তুমি পারো?
চিনতে যদি পেরেই থাকো
ঘেন্না কর, ঘেন্না কর ...

— সুব্রত ঘোষ ও জয়জিৎ লাহিড়ী, *আবার বছর কুড়ি পরে* (১৯৯৫)
মহীনের ঘোড়াগুলি সম্পাদিত গান

আত্মহননে উদ্যত ঈশ্বর চক্রবর্তীকে হরপ্রসাদ প্রশ্ন করেছিলো, ওহে পলাতক, কাপুরুষ ... তোমার এ দশা কেন? তুমিও তো দেখি শূন্যে দোদুল্যমান হইতে চাও। (*সুবর্ণরেখা,* ঋত্বিক ঘটক, ১৯৬৫)। ঈশ্বর চক্রবর্তীর ট্র্যাজেডি দেবদাস মুখুজ্জ্যের ছিলো না। সে নেহাতই বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে।

> আমার মতে দেবদাস ভারতীয় যুবসমাজের জন্য প্রযোজ্য। আমরা আত্মকরুণার বিলাপে অভ্যস্ত। আমাদের ছবির গান আত্মকরুণার ঐতিহ্য বহন করে। দেবদাস আত্মকরুণার মূর্ত রূপ।
>
> —অনুরাগ কাশ্যপ, *মেকিং অফ দেব ডি*

১৯২৮ থেকে এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটি নিয়ে তৈরি ছবির সারিতে অনুরাগের ছবিটি দ্বাদশ। প্রত্যক্ষ চলচ্চিত্রায়ণ ছাড়াও বহু ভারতীয় ছবিই উপন্যাসটি থেকে অনুপ্রাণিত, উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, গুরু দত্তের *প্যায়সা* (১৯৫৭) অথবা প্রকাশ মেহরার *মুকাদ্দার কা সিকান্দার* (১৯৭৮)। এক কথায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দেবদাসের উপস্থিতি এখন মিথ। ভারতীয় সভ্যতার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এমন অনেক মিথকে কেমন করে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যবহার করে তাদের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডিকে বার করে আনা যায় তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন ঋত্বিককুমার ঘটক। অনুরাগ কাশ্যপ ঋত্বিক ঘটক নন।

অনুরাগ কি মিথকে ভাঙেন? তাঁর ছবির একেবারে শেষে পরিচয়লিপি তেমনই নির্দেশ করে। সমগ্র পরিচয়লিপি শুরু হয় উলটো করে, তারপর একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে সোজা হয়। অনুরাগ দেবদাসের মিথকে উলটোদিক থেকে পড়তে শুরু করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যে কাহিনীর পটভূমি তাকে একবিংশ শতকের গোড়ায় নিয়ে এসে ফেললে স্বভাবতঃই তার কিছু মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য চলচ্চিত্রকার চাইলে উপন্যাসের সময়কালকে ধরে রেখেই পিরিয়ড ছবি হিসাবে ছবিটি তৈরি করতে পারেন, এ যাবৎ ভারতীয় চলচ্চিত্রকারেরা অধিকাংশই তাই করে এসেছেন। অনুরাগ সে পথে হাঁটেননি। তাঁর *দেব ডি* পাঞ্জাবের ধনী শিল্পপতির সন্তান, পারো তাঁদের ম্যানেজারের কন্যা। এইখানে একটু চলচ্চিত্রগত ঠাট্টা আছে। ভারতীয় ছবির যে অংশটাকে ইদানীং 'বলিউড' বলা হচ্ছে, যার প্রতিভূ মূলতঃ যশরাজ ঘরানার ছবি, পাঞ্জাব নিয়ে তাদের বিশেষ আকুলতা আছে। এই জাতীয় ছবিতে যে দিগন্তবিস্তৃত হলুদ শর্ষেক্ষেতে ঢাকা স্বপ্নজগৎ দেখা যায়, তা নেহাতই প্রবাসী ভারতীয়ের 'দেশ' নামে এক নস্টালজিয়ার ফসল। অনুরাগের ছবিতে সাধারণতঃ এমন ঝকঝকে বলিউডমার্কা হলদেটে দৃশ্যাবলীর প্রাধান্য দেখা যায়। ছবির প্রথমদিকটা, যেটা 'পারো'-র কাহিনী তার প্রায় সবটা জুড়ে এই উজ্জ্বল হলুদ রঙের ব্যবহার আসলে বলিউডি ছবির ওই নস্টালজিয়াকে ক্রমাগত ঠাট্টা করতে থাকে। যে পবিত্র, অনাহত 'দেশ'-এর কথা

বলিউডি ছবিগুলি তুলে ধরতে চায়, তা যে কত মেকি এবং প্রথাসর্বস্ব, অনুরাগের ছবি সারাক্ষণ চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়।

এই অংশেই একটি বিবাহ ও একটা বাগদান অনুষ্ঠান দেখতে পাই। এ জাতীয় অনুষ্ঠান ভারতীয় দর্শক ছবির পর্দায় বহুকাল ধরে দেখছেন। রাজ্যশ্রী পিকচার্সের ছবিগুলি বা বালাজী টেলিফিল্মসের সিরিয়ালগুলিকে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের বিশ্বকোষ বলা চলে। অথচ কি অনায়াস নিস্পৃহতায় অনুরাগ আমাদের দেখিয়ে চলেন শুধুমাত্র লোকজনের সেলফোনে কথা বলা ও খাবার খাওয়ার দৃশ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির দানবীয় নির্মাণটির আড়ালে যে ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু, প্রথাবদ্ধতা তা চিনে নিতে ভুল করে না প্রায় তথ্যচিত্রধর্মী ক্যামেরা। এই অংশ জুড়ে শব্দের কতগুলি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ আছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। 'পারো' অংশে ছবির গতি কিছু শ্লথ, তবে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হয়। কারণ খানিক পরেই দেব যখন শহরে এসে পড়বে তখন ছবির গতি একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়ে অন্যরকম উদ্দীপনা তৈরি করবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই শ্লথতার একটা প্রয়োজন ছিলো। তবু কিছু অংশ কেটে বাদ দিলে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

যৌনতা, মাদক ও সমাজের তথাকথিত আঁধারগলিগুলি নিয়ে অনুরাগের কোনকানে কোন ছুৎমার্গ ছিলো না। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম ছবি *পাঁচ* (২০০৩) ভারতীয় সেন্সরবোর্ড এখনও আটকে রেখেছে, অতিরিক্ত মাদক, যৌনতা ও হিংসার প্রতিরূপায়ম যুবসমাজের উপর কুপ্রভাব ফেলতে পারে, এই অজুহাতে। অথচ আজকের প্রজন্ম জানে এর মধ্যে কোন অতিরিক্ত মানে খোঁজার প্রয়োজন নেই। আর পাঁচটা সামাজিক ও শারীরিক প্রবৃত্তির মত এগুলোও আছে, সমস্ত সমালোচনা, সচেতনতা ও বাহাদুরির আখ্যানের সাথে সহাবস্থানেই আছে। আসলে দিনের পর দিন খারাপ কবিতা পড়লে মানুষের চেতনার যে ক্ষতি হয়, মাদকসেবনে তার চেয়ে বেশী কিছু হয় না। অনুরাগের নায়কের হাতে নেশার বিবিধ উপকরণ, যার অনেকগুলিকেই আমরা চিনেও না চেনার ভান করেছি। আর যাঁরা ওই নেশার জগতের সংকেতগুলি ঠিকঠাক

ধরতে পেরেছেন, তাঁরা মুচকি হেসেছেন। নেশার জগৎ নির্মাণে অবশ্য চিত্রগ্রাহক রাজীব রবি, শিল্পনির্দেশকদ্বয় হেলেন জোসে ও সুকান্ত পি.-র অবদান অনস্বীকার্য। *পাঁচ* (২০০৩) বা *ব্ল্যাক ফ্রাইডে* (২০০৪) থেকে *নো স্মোকিং* (২০০৭)— সর্বত্রই ছবির জগৎ নির্মাণে অনুরাগ-রাজীব জুটির বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গেছে। কতগুলি অতিচেনা পরিসরকে সম্পূর্ণ অচেনা করে তোলার কূটকৌশল তাঁদের করায়ত্ত, অতিসাধারণ বস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রয়োগে কতগুলি নতুন তল (surface) তৈরি করতে দক্ষ এবং এই সবের মিশেলে এক আশ্চর্য জগৎ নির্মাণ করতে পারেন, যা বাস্তব ও অবাস্তবের সীমানায় অবস্থান করে। লেনি ওরফে চন্দা এবং দেব শহরে এসে পৌঁছনোর পর থেকে আমরা কেবলই এই জাতীয় স্থান দেখতে পাই। তা দেবের সস্তার হোটেলের আস্তানাই হোক বা চন্দার বেশ্যালয়ের ঘর। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নজর কেড়ে নেয় বোধ হয় সেই নামহীন পানশালা যেখান থেকে চুনি দেবের বন্ধু হয়ে ওঠে আর আমরা পেয়ে যাই 'টোয়াইলাইট প্লেয়ার্স' নামে এক আজব নাচিয়ে-গাইয়ে ত্রয়ীকে। অনুরাগ তাঁর ছবিতে যে সাবলীলতায় ক্রমাগত নিওরিয়াল থেকে সুররিয়াল স্থানের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকেন সেই অস্থিতিই ছবির চরিত্রগুলিকে তাদের বেড়ে ওঠার ভিত্তিভূমি দেয়। অনুরাগের দেব এক স্বার্থমগ্ন, উদ্ধত, অসহিষ্ণু, আত্মধ্বংসকামী যুবক, পারো যৌনতায় মুখর, স্পষ্টভাষী, আত্মপ্রত্যয়ী মেয়ে, চন্দা এক বহুজাতিক, বহুভাষী, বিপন্ন বিদ্যালয়ছাত্রী, যে স্বেচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেয়, চুনি এক বেশ্যাবাড়ির দালাল। এককথায় সমস্ত সামাজিক অবলম্বন কেড়ে নিলে, মিথিকাল চরিত্রগুলি ঠিক কেমন ব্যবহার করে, সেটাই যেন দেখে নিতে চান অনুরাগ। এককালে প্রাণীবিদ্যার ছাত্রটি তাঁর চরিত্রদের চিত্রনাট্যের পাতার চেয়ে বুঝিবা ব্যবচ্ছেদের টেবিলেই বেশি ভাল চিনতে পারেন।

যৌনতা এ ছবির এক মুখ্য চালিকাশক্তি। মূলধারার অন্যান্য ছবির মত নারী এখানে শুধুমাত্র পুরুষের কামনার বস্তু নয়। তার খুব স্পষ্ট কিছু যৌন ইচ্ছা আছে এবং নিঃসংকোচে তা জাহির করতেও সে পিছপা নয়। মেকি সতীত্বের খামোখা ন্যাকামি তার নেই। পারো বা

রসিকা (ভুবনের বোন)-র নির্মাণ তীব্র যৌনতার প্রতিমূর্তি হিসাবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, পারো বা চন্দার সোচ্চার যৌনতার সামনে দেব প্রায়শঃই অসহায়, হাস্যাস্পদ এক ক্রীড়নক মাত্র। ঠিক এইখানে অনুরাগ কাশ্যাপের জিত। দেবদাসের মত একটি আদ্যন্ত পুরুষসর্বস্ব কাহিনীর একটি নারীবাদী মূল্যায়ন উপস্থিত করে, সনাতন ভারতীয় নীতিবোধের গন্ডদেশে তিনি একটি সজোর চপেটাঘাত করেন। বহুচর্চিত আখক্ষেতের সঙ্গমশয্যা ও পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যাতা পারো-র প্রতীকি রাগমোচন দৃশ্যটির পর ভারতীয় চলচ্চিত্রের পিতৃপুরুষগণ ভেবে দেখতে পারেন, আমাদের আর আদৌ কোনো রমণকক্ষের প্রয়োজন আছে কি না! নারীকে রমণী হিসাবে দেখার ভিতর দিয়ে আপনারা যে সৌন্দর্যের সন্দর্ভগুলি খাড়া করেছেন, মূলধারা ও সমান্তরাল ধারা ব্যতিরেকে, সেই প্রতিমূর্তিগুলি এমন সোচ্চার যৌনদাবী নিয়ে উপস্থিত হলে আপনারা স্পষ্টতঃই বিব্রত ও আক্রান্ত বোধ করবেন না কি? অনুরাগ দেব-পারো বা দেব-চন্দার শ্রেণীবৈষম্য নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন, কারণ তিনি আবহমান যৌনদমনের ম্লান মুখগুলি চেনেন। দেবের ঠুনকো পৌরুষকে চূড়ান্ত অপমানের চাবুকে নগ্ন করে দিয়ে পারো যখন বলে, 'তেরা অওকাত দিখা রাহা হুঁ', তখন ওই একটি উচ্চারণে সে যাবতীয় আত্মলিপ্ত পৌরুষের আস্ফালনকে তাদের 'অওকাত' দেখিয়ে দেয়।

অপরদিকে চন্দা, যে মেয়েকে পুরুষ কেবল ভোগই করেছে, তারপর তার কৈশোরের সারল্যকে তছনছ করে, তাকে বেশ্যা বলে, অনায়াসে হাত ধুয়ে ফেলেছে, সে মেয়ে হাত ধরে দেবকে যৌনতার পাঠ শেখায়। তার নেশাগ্রস্ত বিকারে ডুবে যেতে যেতে দেব বুঝতে পারে নারীকে বিজয়ীর মত, প্রভুর মত অধিকার করা যায় না, তার কাছে তাকে ভিখারীর মতই যেতে হবে, সব খুইয়ে, নিঃস্ব হয়ে। তবেই সে নারী তাকে হাত ধরে কাছে টেনে নেবে, দেবে বন্ধুর সমমর্যাদা। অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে শেখা এই পাঠটুকুই পুরুষের প্রাপ্তি। এটুকু শুরুতে বুঝলে দেবের এই আত্মধ্বংসের প্রয়োজন হত কি না কে জানে? শোনা যায়, শরৎচন্দ্রের নিজের মতেও এটি তাঁর খুব খারাপ উপন্যাসগুলির একটি। সুপরিকল্পিত নয় বলেই হয়ত দেবদাসের

কতগুলি অন্তর্নিহিত সত্যভাষণ আছে। পৌরুষের সেই অপরিমার্জিত পাঠটুকু ছেঁকে তুলে আনতে পারেন বলেই অনুরাগ তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ান। আমাদের প্রজন্ম তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে, দেবদাসের আপাতসারল্যের ভণিতা তার স্বার্থপর হিংস্রতার মুখোশমাত্র। সারল্যের যাবতীয় খোলস আমরা ইতিপূর্বেই মোচন করেছি এবং তা নিয়ে আমাদের কোন পাপবোধ নেই। দেব আত্মধ্বংসের পথে হাঁটে কারণ সে তার সামন্ততান্ত্রিক অতীতকে ভুলতে পারে না, অথচ যে আধুনিকতার দম্ভে সে পারোকে প্রত্যাখ্যান করে, তার অন্তর্নিহিত সাম্যকেও সে বরণ করে নিতে পারে না। তারই প্রত্যাখ্যান ও অপমান আশ্চর্য সাবলীলতায় ফিরিয়ে দেওয়া পারোকে সে সহ্য করতে পারে না, এদিকে চন্দাকে 'রেন্ডি' বলতে তার বাধে। চন্দা ধরিয়ে দেয়, 'হোর, এসকর্ট', তারপর বলে— আমার আর এক ক্লায়েন্ট আছে, কুর্তাওয়ালা (পড়ুন এন.জি.ও.), সেও রেন্ডি বলতে পারে না। বলে সি. এস. ডাব্লু, কমার্শিয়াল সেক্স ওয়ার্কার।

একটানে ভদ্রলোকের পলিটিকাল কারেক্টনেসের মুখোশ খুলে দেয় সেই মেয়ে, ইন্টারনেট থেকে যার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ডাউনলোড করে দেখে বীর্যপাত করেছে অর্ধেক দেশ। যৌনতার এই ভাস্বর আলোকে নিজেদের দিকে তাকিয়ে ঘেন্না পাওয়া আমাদের সত্যিই বাকি ছিলো।

গোটা ছবি জুড়ে এমন শানিত বিদ্রূপ ও রসোত্তীর্ণ উল্লেখের অসংখ্য ঝিলিক। তাঁর *দেবদাস* (২০০২) ছবিটিতে পারো ও চন্দ্রমুখীর সাক্ষাৎ ও সখ্য ঘটিয়েছিলেন সঞ্জয় লীলা বনশালী। অনুরাগ একটি ছোট্ট প্রায় গুরুত্বহীন দৃশ্যে দুজনের দেখা করিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে যান, ওসব চটক্‌দারি চাইলে তিনিও করতে পারতেন, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করেননি। দেব-চুনির প্রথম আলাপের দৃশ্যে পশ্চাদপটে ঝলমলে নিয়ন আলোয় লেখা থাকে 'রান্ড', দেবের হোটেলের ঘরে দেওয়াল জুড়ে থাকে বাজারি গ্রাফিত্তি। নামহীন পানশালায়, চন্দার ঘরের দেওয়াল জুড়ে থাকে গ্রাফিক নভেলের ইশারা। পানশালার বাইরে লাগানো থাকে বনশালীর দেবদাসরূপী শাহরুখ খানের ছবি, লাঞ্ছিত হয়ে জীবনের খাদের কিনারে দাঁড়ানো